সাহিত্যের স্বরূপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অঙ্কিত
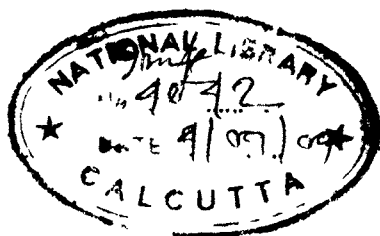
১ বৈশাখ ১৩৫০

মূল্য ছয় আনা

মুদ্রাকর শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

১১০—১৩৪৩

বিজ্ঞপ্তি

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগ-শিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন।

১ বৈশাখ ১৩৫০
শান্তিনিকেতন

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

সূচী

সাহিত্যের স্বরূপ

কবিতা ব্যাপারটা কী, এই নিয়ে দু-চার কথা বলবার জন্যে ফরমাশ এসেছে।

সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার পূর্বেই কোথাও কোথাও করেছি। সেটা অন্তরের উপলব্ধি থেকে, বাইরের অভিজ্ঞতা বা বিশ্লেষণ থেকে নয়। কবিতা জিনিসটা ভিতরের একটা তাগিদ, কিসের তাগিদ সেই কথাটাই নিজেকে প্রশ্ন করেছি। যা উত্তর পেয়েছি সেটাকে সহজ করে বলা সহজ নয়। ওস্তাদ-মহলে এই বিষয়টা নিয়ে যে-সব বাঁধা বচন জমা হয়ে উঠেছে কথা উঠলেই সেইগুলোই এগিয়ে আসতে চায়, নিজের উপলব্ধ অভিমতকে পথ দিতে গেলে ওইগুলোকে ঠেকিয়ে রাখা দরকার।

গোড়াতেই গোলমাল ঠেকে "সুন্দর" কথাটা নিয়ে। সুন্দরের বোধকেই বোধগম্য করা কাব্যের উদ্দেশ্য এ-কথা কোনো উপাচার্য আওড়াবামাত্র অভ্যস্ত নির্বিচারে বলতে ঝোঁক হয়, তা তো বটেই। প্রমাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে ধোঁকা লাগায়, ভাবতে বসি সুন্দর বলে কাকে। কনে দেখবার বেলায় বরের অভিভাবক যে-আদর্শ নিয়ে কনেকে দাঁড় করিয়ে দেখে, হাঁটিয়ে দেখে, চুল খুলিয়ে দেখে, কথা কইয়ে দেখে, সে-আদর্শ কাব্য-যাচাইয়ের কাজে লাগাতে গেলে পদে পদেই বাধা পাওয়া যায়। দেখতে পাই ফলস্টাফের সঙ্গে কন্দর্পের তুলনা হয় না, অথচ সাহিত্যের চিত্রভাণ্ডার থেকে কন্দর্পকে বাদ দিলে লোকসান নেই, লোকসান আছে ফলস্টাফকে বাদ দিলে। দেখা গেল সীতার চরিত্র রামায়ণে মহিমান্বিত বটে কিন্তু স্বয়ং বীর হনুমান, তার যতবড়ো লাঙ্গুল ততবড়োই সে মর্যাদা পেয়েছে। এইরকম সংশয়ের সময়ে কবির বাণী

মনে পড়ে Truth is beauty অর্থাৎ সত্যই সৌন্দর্য। কিন্তু সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রস পাই, অন্তরের মধ্যে যখন পাই তার নিবিড় উপলব্ধি জ্ঞানে নয় স্বীকৃতিতে, তাকেই বলি বাস্তব। সর্বগুণাধার যুধিষ্ঠিরের চেয়ে হঠকারী ভীম বাস্তব, রামচন্দ্র যিনি শাস্ত্রের বিধি মেনে ঠাণ্ডা হয়ে থাকেন তাঁর চেয়ে লক্ষ্মণ বাস্তব যিনি অন্যায় সহ্য করতে না পেরে অগ্নিশর্মা হয়ে তার অশাস্ত্রীয় প্রতিকার করতে উদ্যত। আমাদের কালোকোলো আধবুড়ো নীলমণি চাকরটা, যে-মানুষ এক বুঝতে আর বোঝে, এক করতে আর করে, বকলে ঈষৎ হেসে বলে ভুল হয়ে গেছে সে বেনারসি জোড় পরে বরবেশে এলে দৃশ্যটা কী রকম হয় সে-কথা তুচ্ছ, কিন্তু সে অনেক বেশি বাস্তব অনেক নামজাদার চেয়ে; এই প্রসঙ্গে তাঁদের নাম উল্লেখ করতে কুণ্ঠা হচ্ছে। অর্থাৎ যদি কবিতা লেখা যায় তবে একে তার নায়ক বা উপনায়ক করলে ঢের বেশি উপাদেয় হবে কোনো বাগ্মীপ্রবর গণনায়ককে করার চেয়ে। (খুব বেশি চেনা হলেই যে বাস্তব হয় তা নয়, কিন্তু যাকে চিনি অল্প তবু যাকে অপরিহার্যরূপে হাঁ বলেই মানি সেই আমার পক্ষে বাস্তব: ঠিক কী গুণে যে, তা বিশ্লেষণ করে বলা কঠিন।) বলা যেতে পারে তারা জৈব, তারা organic, তাদের আত্মসাৎ করতে রুচি বা ইচ্ছার বাধা থাকতে পারে, অন্য বাধা নেই। যেমন ভোজ্য পদার্থ, তাদের কোনোটা তিতো, কোনোটা মিষ্টি, কোনোটা কটু; ব্যবহারে তাদের সম্বন্ধে আদরণীয়তার তারতম্য থাকলেও, তাদের সকলেরই মধ্যে একটা সাম্য আছে, তারা জৈবিক, দেহতন্তুর নির্মাণে তারা কাজে লাগবার উপযোগী। শরীরের পক্ষে তারা হাঁ-এর দলে, স্বীকৃতির দলে, না-এর দলে নয়।

সংসারে আমাদের সকলেরই চারদিকে এই হাঁ-ধর্মীর মণ্ডলী আছে,—এই বাস্তবদের আবেষ্টন; তাদের সকলকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে

আমাদের সত্তা আপনাকে বিচিত্র করেছে বিস্তীর্ণ হয়েছে; তারা কেবল মানুষ নয়, তারা কুকুর বেড়াল ঘোড়া টিয়েপাখি কাকাতুয়া, তারা আসশেওড়ার বেড়া-দেওয়া পানাপুকুর, তারা গোঁসাইপাড়ার পোড়ো বাগানে ভাঙাপাঁচিল-ঘেঁষা পালতে মাদার, গোয়ালঘরের আঙিনায় খড়ের গাদার গন্ধ, পাড়ার মধ্য দিয়ে হাটে যাওয়ার গলি-রাস্তা, কামার-শালায় হাতুড়ি-পেটার আওয়াজ, বহুপুরোনো ভেঙেপড়া ইটের পাঁজা, যার উপরে অশথগাছ গজিয়ে উঠেছে, রাস্তার ধারের আমড়াতলায় পাড়ার প্রৌঢ়দের তাসপাশার আড্ডা, আরো কত কী যা কোনো ইতিহাসে স্থান পায় না, কোনো ভূচিত্রের কোণে আঁচড় কাটে না। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে পৃথিবীর চারিদিক থেকে নানা ভাষায় সাহিত্যলোকের বাস্তবের দল। ভাষার বেড়া পেরিয়ে তাদের মধ্যে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয় খুশি হয়ে বলি বাঃ বেশ হল, অর্থাৎ মিলছে প্রাণের সঙ্গে, মনের সঙ্গে। তাদের মধ্যে রাজাবাদশা আছে, দীনদুঃখীও আছে, সুপুরুষ আছে, সুন্দরী আছে, কানা খোঁড়া কুঁজো কুৎসিতও আছে; এই সঙ্গে আছে অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া, কোনোকালে বিধাতার হাত পড়ে নি যাদের উপরে, প্রাণীতত্ত্বের সঙ্গে শারীরতত্ত্বের সঙ্গে যাদের অস্তিত্বের অমিল, প্রচলিত রীতিপদ্ধতির সঙ্গে যাদের অমানান বিস্তর। আর আছে তারা যারা ঐতিহাসিকতার ভড়ং ক'রে আসরে নামে, কারো বা মোগলাই পাগড়ি, কারো বা যোধপুরী পায়জামা, কিন্তু যাদের বারো আনা জাল ইতিহাস, প্রমাণপত্র চাইলে যারা নির্লজ্জভাবে বলে বসে কেয়ার করি নে প্রমাণ, পছন্দ হয় কি না দেখে নাও;—এ ছাড়া আছে ভাবাবেগের বাস্তবতা,—দুঃখসুখ বিচ্ছেদমিলন লজ্জাভয় বীরত্ব-কাপুরুষতা, এরা তৈরি করে সাহিত্যের বায়ুমণ্ডল, এইখানে রৌদ্রবৃষ্টি, এইখানে আলো-অন্ধকার, এইখানে কুয়াশার বিড়ম্বনা, মরীচিকার চিত্রকলা। বাইরে

থেকে মানুষের এই আপন ক'রে নেওয়া সংগ্রহ, ভিতর থেকে মানুষের এই আপনার সঙ্গে মেলানো সৃষ্টি, এই তার বাস্তবমণ্ডলী, বিশ্বলোকের মাঝখানে এই তার অন্তরঙ্গ মানবলোক, এর মধ্যে সুন্দর অসুন্দর, ভালো মন্দ, সংগত অসংগত, সুরওয়ালা এবং বেসুরো সবই আছে, যখনই নিজের মধ্যেই তারা এমন সাক্ষ্য নিয়ে আসে যে তাদের স্বীকার করতে বাধ্য হই, তখনি খুশি হয়ে উঠি। বিজ্ঞান ইতিহাস তাদের অসত্য বলে বলুক, মানুষ আপন মনের একান্ত অনুভূতি থেকে তাদের বলে নিশ্চিত সত্য। এই সত্যের বোধ দেয় আনন্দ, সেই আনন্দেই তার শেষ মূল্য। তবে কেমন করে বলব সুন্দরবোধকে বোধগম্য করাই কাব্যের উদ্দেশ্য।

বিষয়ের বাস্তবতা উপলব্ধি ছাড়া কাব্যের আর-একটা দিক আছে সে তার শিল্পকলা। যা যুক্তিগম্য তাকে প্রমাণ করতে হয়, যা আনন্দময় তাকে প্রকাশ করতে চাই। যা প্রমাণযোগ্য তাকে প্রমাণ করা সহজ, যা আনন্দময় তাকে প্রকাশ করা সহজ নয়। খুশি হয়েছি এই কথাটা বোঝাতে লাগে সুর, লাগে ভাবভঙ্গী। এই কথাকে সাজাতে হয় সুন্দর ক'রে, মা যেমন করে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, বাসরঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়। কথার শিল্প তার ছন্দে, ধ্বনির সংগীতে, বাণীর বিন্যাসে ও বাছাই-কাজে। এই খুশির বাহন অকিঞ্চিৎকর হলে চলে না, যা অত্যন্ত অনুভব করি সেটা যে অবহেলার জিনিস নয় এই কথা প্রকাশ করতে হয় কারুকাজে।

অনেক সময়ে এই শিল্পকলা শিল্পিতকে ডিঙিয়ে আপনার স্বাতন্ত্র্যকেই মুখ্য করে তোলে। কেননা তার মধ্যেও আছে সৃষ্টির প্রেরণা। লীলায়িত অলংকৃত ভাষার মধ্যে অর্থকে ছাড়িয়েও একটা বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পায়,

সে তার ধ্বনিপ্রধান গীতধর্মে। বিশুদ্ধ সংগীতের স্বরাজ তার আপন ক্ষেত্রেই,—ভাষার সঙ্গে শরিকিয়ানা করবার তার জরুরি নেই। কিন্তু ছন্দে, শব্দবিন্যাসের ও ধ্বনিঝংকারের তির্যক ভঙ্গীতে যে সংগীতরস প্রকাশ পায় অর্থের কাছে অগত্যা তার জবাবদিহি আছে। কিন্তু ছন্দের নেশা ধ্বনিপ্রসাধনের নেশা অনেক কবির মধ্যে মৌতাতি উগ্রতা পেয়ে বসে, গদ্‌গদ আবিলতা নামে ভাষায়,—স্ত্রৈণ স্বামীর মতো তাদের কাব্য কাপুরুষতার দৌর্বল্যে অশ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে।

শেষ কথা হচ্ছে Truth is beauty। কাব্যে এই ট্রুথ রূপের ট্রুথ, তথ্যের নয়। কাব্যে রূপ যদি ট্রুথরূপে অত্যন্ত প্রতীতিযোগ্য না হয় তাহলে তথ্যের আদালতে সে অনিন্দনীয় প্রমাণিত হলেও কাব্যের দরবারে সে নিন্দিত হবে। মন ভোলাবার আসরে তার অলংকারপুঞ্জ যদি বা অত্যন্ত গুঞ্জরিত হয় অর্থাৎ সে যদি মুখর ভাষায় সুন্দরের গোলামি করে, তবু তাতে তার অবাস্তবতা আরো বেশি করেই ঘোষণা করে, আর এতেই যারা বাহবা দিয়ে ওঠে রূঢ় শোনালেও বলতে হবে তাদের মনের ছেলেমানুষি ঘোচে নি।

শেষকালে একটা কথা বলা দরকার বোধ করছি। ভাবগতিকে বোধ হয় আজকাল অনেকের কাছেই বাস্তবের সংজ্ঞা হচ্ছে "যা-তা"। কিন্তু আসল কথা, বাস্তবই হচ্ছে মানুষের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিজের বাছাই-করা জিনিস। নির্বিশেষে বিজ্ঞানে সমান মূল্য পায় যা-তা। সেই বিশ্বব্যাপী যা-তা থেকে বাছাই হয়ে যা আমাদের আপন স্বাক্ষর নিয়ে, আমাদের চারপাশে এসে ঘিরে দাঁড়ায় তারাই আমাদের বাস্তব। আর যে-সব অসংখ্য জিনিস নানা মূল্য নিয়ে নানা হাটে যায় ছড়াছড়ি, বাস্তবের মূল্যবর্জিত হয়ে তারা আমাদের কাছে ছায়া।

পাড়ায় মদের দোকান আছে সেটাকে ছন্দে বা অছন্দে কাব্যরচনায়

ভুক্ত করলেই কোনো কোনো মহলে সস্তা হাততালি পাওয়ার আশা আছে। সেই মহলের বাসিন্দারা বলেন, বহুকাল ইন্দ্রলোকে সুধাপান নিয়েই কবিরা মাতামাতি করেছেন, ছন্দেবন্ধে শুঁড়ির দোকানের আমেজমাত্র দেন নি—অথচ শুঁড়ির দোকানে হয়তো তাঁদের আনাগোনা যথেষ্ট ছিল। এ নিয়ে অপক্ষপাতে আমি বিচার করতে পারি—কেননা আমার পক্ষে শুঁড়ির দোকানে মদের আড্ডা যতদূরে ইন্দ্রলোকের সুধাপানসভা তার চেয়ে কাছে নয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পরিচয়ের হিসাবে। আমার বলবার কথা এই যে, লেখনীর জাদুতে কল্পনার পরশমণি-স্পর্শে মদের আড্ডাও বাস্তব হয়ে উঠতে পারে সুধাপানসভাও। কিন্তু সেটা হওয়া চাই। অথচ দিনক্ষণ এমন হয়েছে যে ভাঙা ছন্দে মদের দোকানে মাতালের আড্ডার অবতারণা করলেই আধুনিকের মার্কা মিলিয়ে যাচনদার বলবে, হাঁ, কবি বটে, বলবে, একেই তো বলে রিয়ালিজ্‌ম্।—আমি বলছি বলে না। রিয়ালিজ্‌মের দোহাই দিয়ে এ-রকম সস্তা কবিত্ব অত্যন্ত বেশি চলিত হয়েছে। আর্ট এত সস্তা নয়। ধোবার বাড়ির ময়লা কাপড়ের ফর্দ নিয়ে কবিতা লেখা নিশ্চয়ই সম্ভব, বাস্তবের ভাষায় এর মধ্যে বস্তাভরা আদি রস, করুণ রস এবং বীভৎস রসের অবতারণা করা চলে। যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুইবেলা বকাবকি চুলোচুলি, তাদের কাপড়দুটো একঘাটে একসঙ্গে আছাড় খেয়ে খেয়ে নির্মল হয়ে উঠছে, অবশেষে সওয়ার হয়ে চলেছে একই গাধার পিঠে, এ-বিষয়টা নব্য চতুষ্পদীতে দিব্য মানানসই হতে পারে। কিন্তু বিষয়-বাছাই নিয়ে তার রিয়ালিজ্‌ম্ নয়, রিয়ালিজ্‌ম্ ফুটবে রচনার জাদুতে। সেটাতেও বাছাইয়ের কাজ যথেষ্ট থাকা চাই, না যদি থাকে তবে অমনতরো অকিঞ্চিৎকর আবর্জনা আর কিছুই হতে পারে না। এ নিয়ে বকাবকি না করে সম্পাদকের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, প্রমাণ করুন রিয়ালিস্টিক কবিতা কবিতা বটে, কিন্তু রিয়ালিস্টিক

ব'লে নয় কবিতা ব'লেই। পূর্বোক্ত বিষয়টা যদি পছন্দ না হয় তো আর-একটা বিষয় মনে করিয়ে দিচ্ছি বহুদিনের বহুপদাহত ঢেঁকির আত্মকথা। প্রাচীনযুগে অশোকগাছে সুন্দরীর পদস্পর্শ-ব্যাপারের চেয়েও হয়তো একে বেশি মর্যাদা দিতে পারবেন বিশেষত যদি চরণপাত বেছে বেছে অসুন্দরীদের হয়। আর যদি শুকিয়ে-পড়া খেজুরগাছের উপর কিছু লিখতে চান, তাহলে বলতে পারবেন ওই গাছ আপন রসের বয়সে কত ভিন্ন ভিন্ন জীবনে কত ভিন্ন ভিন্ন রকমের নেশার সঞ্চার করেছে; তার মধ্যে হাসিও ছিল কান্নাও ছিল ভীষণতাও ছিল। সেই নেশা যে-শ্রেণীর লোকের তার মধ্যে রাজাবাদশা নেই, এমন কি এম. এ. পরীক্ষার্থী অন্যমনস্ক তরুণ যুবকও নেই, যার হাতে কবজি-ঘড়ি, চোখে চশমা, এবং অঙ্গুলিকর্ষণে চুল-গুলো পিছনের দিকে তোলা। বলতে বলতে আর-একটা কাব্য-বিষয় মনে পড়ল। একটুকু তলানিওয়ালা লেবেল-উঠে-যাওয়া চুলের তেলের নিশ্ছিপি একটা শিশি, চলেছে সে তার হারা জগতের অন্বেষণে, সঙ্গে সাথি আছে একটা দাঁতভাঙা চিরুনি আর শেষক্ষয়-ক্ষয়ে-যাওয়া সাবানের পাতলা টুকরো। কাব্যটির নাম দেওয়া যেতে পারে আধুনিক রূপকথা। তার ভাঙা ছন্দে এই দীর্ঘনিশ্বাস জেগে উঠবে যে কোথাও পাওয়া গেল না সেই খোয়ানো জগৎ। এই সুযোগে সেদিনকার দেউলে অতীতের এই তিনটি উদ্বৃত্ত সামগ্রী বিশ্ববিধি ও বিধাতাকে বেশ একটু বিদ্রূপ করে নিতে পারে, বলতে পারে শৌখিন মরীচিকার ছদ্মবেশ পরে বাবুয়ানার অভিনয় করত ওই মহাকালের নাট্যমঞ্চের সঙ,—আজ নেপথ্যে উঁকি মারলে তাকে আর চেনাই যায় না; এমন ফাঁকির জগতে সত্য যদি কাউকে বলা যায় তবে তার প্রতীক বাজারদরের বাইরেকার আমরা কটিই, এই তলানি তেলের শিশি, এই দাঁতভাঙা চিরুনি, আর ক্ষয়ে-যাওয়া পাতলা সাবানের টুকরো; আমরা রীয়ল, আমরা ঝাঁটানি-মালের ঝুড়ি থেকে আধুনিকতার

রসদ জোগাই। আমাদের কথা ফুরোয় যেই, দেখা যায় নটেগাছটি মুড়িয়েছে; কালের গোয়ালঘরের দরজা খোলা, তার গোরুতে দুধ দেয় না, কিন্তু নটেগাছটি মুড়িয়ে খায়। তাই আজ মানুষের সব আশাভরসা-ভালোবাসার মুড়োনো নটেগাছটার এত দাম বেড়ে গেছে কবিত্বের হাটে। গোরুটাও হাড়-বের-করা, শিংভাঙা, কাকের-ঠোকর-খাওয়া ক্ষতপৃষ্ঠ, গাড়োয়ানের মোচড় খেয়ে খেয়ে গ্রন্থিশিথিল ল্যাজওয়ালা হওয়া চাই। লেখকের অনবধানে এ যদি সুস্থ সুন্দর হয় তাহলে মিড-ভিক্টোরীয় যুগবর্তী অপবাদে লাঞ্ছিত হয়ে আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে তাড়া খেয়ে মরতে যাবে সমালোচকের কশাইখানায়।

১৩৪৪

কাব্যে গদ্যরীতি

গানের আলাপের সঙ্গে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের গদ্যিকা রীতির যে তুলনা করেছ সেটা মন্দ হয় নি। কেননা, আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধনছাড়া হয়েও আত্মবিস্মৃত হয় না। অর্থাৎ বাইরে থাকে না মৃদঙ্গের বোল, কিন্তু নিজের অঙ্গের মধ্যেই থাকে চলবার একটা ওজন।

কিন্তু সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে-কথা বলা বাহুল্য। অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এ-পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে, "যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।" বাক্ এবং অবাক্ বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্যবন্ধনে। এই বাক্ এবং অবাক্-এর একান্ত মিলনেই কাব্য। বিবাহিত জীবনে যেমন কাব্যেও তেমনি, মাঝে মাঝে বিরোধ বাধে, উভয়ের মাঝখানে ফাঁক পড়ে যায়, ছন্দও তখন জোড় মেলাতে পারে না। সেটাকেই বলি আক্ষেপের বিষয়। বাসরঘরে এক শয্যায় দুই পক্ষ দুই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মতোই সেটা শোচনীয়। তার চেয়ে আরো শোচনীয় যখন "এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।" যথাপরিমিত খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে এ-কথা অজীর্ণরোগীকেও স্বীকার করতে হয়। কোনো কোনো কাব্যে বাগ্‌দেবী স্থূলখাদ্যাভাবে ছায়ার মতো হয়ে পড়েন। সেটাকে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বলে উল্লাস না করে আধিভৌতিকতার অভাব বলে বিমর্ষ হওয়াই উচিত।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতিককে সমাদর করে ভোজে বসানো

হয়েছে। যেন জামাইষষ্ঠী। এ মানুষটা পুরুষ। একে সোনার ঘড়ির চেন পরালেও অলংকৃত করা হয় না। তা হোক, পাশেই আছেন কাঁকন-পরা অর্ধাবগুণ্ঠিতা মাধুরী. তিনি তাঁর শিল্পসমৃদ্ধ ব্যজনিকার আন্দোলনে এই ভোজের মধ্যে অমরাবতীর মৃদুমন্দ হাওয়ার আভাস এনে দিচ্ছেন। নিজের রচনা নিয়ে অহংকার করছি মনে করে আমাকে হঠাৎ সদুপদেশ দিতে বোসো না। আমি যে কীর্তিটা করেছি তার মূল্য নিয়ে কথা হচ্ছে না, তার যেটি আদর্শ, এই চিঠিতে তারই আলোচনা চলছে। বক্ষ্যমান কাব্যে গদ্যটি মাংসপেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে, তার সেই ছায়াবৃত কটাক্ষ-সহযোগে সমস্ত দৃশ্যটি রসিকদের উপভোগ্য হবে বলেই ভরসা করেছিলুম। এর মধ্যে ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বললেও সেটাকে বলব স্পর্ধা। তবে কী বললে ঠিক হবে ব্যাখ্যা করি। ব্যাখ্যা করব কাব্যরস দিয়েই।

বিবাহসভায় চন্দনচর্চিত বরকনে টোপর মাথায় আলপনা-আঁকা পিঁড়ির উপর বসেছে। পুরুত পড়ে চলেছে মন্ত্র, ওদিকে আকাশ থেকে আসছে শাহানা রাগিণীতে সানাইয়ের সংগীত। এমন অবস্থায় উভয়ের যে বিবাহ চলেছে সেটা নিঃসন্দিগ্ধ সুস্পষ্ট। নিশ্চিত ছন্দওয়ালা কাব্যে সেই সানাই-বাজনা সেই মন্ত্র-পড়া লেগেই আছে। তার সঙ্গে আছে লাল চেলি, বেনারসির জোড়, ফুলের মালা, ঝাড়লণ্ঠনের রোশনাই। সাধারণত যাকে কাব্য বলি সেটা হচ্ছে বচন-অনির্বচনের সদ্য মিলনের পরিভূষিত উৎসব। অনুষ্ঠানে যা যা দরকার সযত্নে তা সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু তার পরে? অনুষ্ঠান তো বারো মাস চলবে না। তাই বলেই তো নীরবিত শাহানা সংগীতের সঙ্গে সঙ্গেই বরবধূর মহাশূন্যে অন্তর্ধান কেউ প্রত্যাশা করে না। বিবাহ-অনুষ্ঠানটা সমাপ্ত হল কিন্তু

বিবাহটা তো রইল, যদি না কোনো মানসিক বা সামাজিক উপনিপাত ঘটে। এখন থেকে শাহানা রাগিণীটা অশ্রুত বাজবে। এমন কি মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বেসুরো নিখাদে অত্যন্ত শ্রুত কড়া সুরও না-মেশা অস্বাভাবিক, সুতরাং একেবারে না-মেশা প্রার্থনীয় নয়। চেলি বেনারসিটা তোলা রইল, আবার কোনো অনুষ্ঠানের দিনে কাজে লাগবে। সপ্তপদীর বা চতুর্দশপদীর পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায় না। তাই বলেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপদজনক হবেই এমন আশঙ্কা করি নে। এমন কি বাম দিক থেকে রুনুঝুনু মলের আওয়াজ গোল-মালের মধ্যেও কানে আসে। তবু মোটের উপর বেশভূষাটা হল আটপৌরে। অনুষ্ঠানের বাঁধা-রীতি থেকে ছাড়া পেয়ে একটা সুবিধে হল এই যে, উভয়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে সংসারযাত্রার বৈচিত্র্য সহজ রূপ নিয়ে স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবে দেখা দিতে লাগল। যুগলমিলন নেই অথচ সংসারযাত্রা আছে এমনো ঘটে। কিন্তু সেটা লক্ষ্মীছাড়া। যেন খবুরে-কাগজি সাহিত্য। কিন্তু যে সংসারটা প্রতিদিনের, অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মীশ্রী চিরদিনের করে তুলছে, যাকে চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলংকৃত আয়োজন করতে হয় না তাকে কাব্যশ্রেণীতেই গণ্য করি। অথচ চেহারায় সে গদ্যের মতো হতেও পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেইজন্যেই চারিত্রশক্তি আছে। যেমন কর্ণের চারিত্র-শক্তি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে অনেক বড়ো। অথচ একরকম শিশুমতি আছে যারা ধর্মরাজের কাহিনী শুনে অশ্রুবিগলিত হয়। রামচন্দ্র নামটার উল্লেখ করলুম না, সে কেবল লোকভয়ে। কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস আদিকবি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে ভূমিকাপত্তনস্বরূপে খাড়া করেছিলেন তার অসবর্ণতায় লক্ষ্মণের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে আঁকবার জন্যেই, এমন কি, হনুমানের

চরিত্রকেও বাদ দেওয়া চলবে না। কিন্তু সেই একঘেয়ে ভূমিকাটা অত্যন্ত বেশি রং-ফলানো চওড়া বলেই লোকে ওইটের দিকে তাকিয়ে হায় হায় করে। ভবভূতি তা করেন নি। তিনি রামচন্দ্রের চরিত্রকে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যেই কবিজনোচিত কৌশলে উত্তররামচরিত রচনা করেছিলেন। তিনি সীতাকে দাঁড় করিয়েছেন রামভদ্রের প্রতি প্রবল গঞ্জনারূপে।

ওই দেখো, কী কথা বলতে কী কথা এসে পড়ল। আমার বক্তব্য ছিল এই, কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তাহলে সাহিত্য-সংসারের আলংকারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক তার চরিত্রের দিক অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচুনিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনো ঘাসের উপর কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।

রোসো। নাচের কথাটা যখন উঠল ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ সময় বিশেষ কায়দা চাই। চারিদিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে-মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাই বা লাগল, তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। তখন মৃদঙ্গকে দোষ দেব, না তার চলনকে? সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর বাসরঘর পর্যন্ত। তার জন্যে মালমশলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্যকাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে ব'লেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গী আবাঁধা। ভিড়ের ছোঁওয়া

বাঁচিয়ে পোশাকী শাড়ির প্রান্ত তুলে ধরা আধঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়।

এই গেল আমার 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়ত। আরো একটা পুনশ্চ-নাচের আসরে নাট্যাচার্য হয়ে বসব না এমন পণ করি নি। কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েছি। এবারকার মতো আমার কাজ ওই পর্যন্ত। সময় তো বেশি নেই। এর পরে আবার কোন্ খেয়াল আসবে বলতে পারি নে। যাঁরা দৈবদুর্যোগে মনে করবেন গদ্যে কাব্যরচনা সহজ তাঁরা এই খোলা দরজাটার কাছে ভিড় করবেন সন্দেহ নেই। তা নিয়ে ফৌজদারি বাধলে আমাকে স্বদলের লোক বলে স্বপক্ষে সাক্ষী মেনে বসবেন। সেই দুর্দিনের পূর্বেই নিরুদ্দেশ হওয়া ভালো। এর পরে মন্দ্রচিত আরো একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরবে, তার নাম 'বিচিত্রিতা'। সেটা দেখে ভদ্রলোকে এই মনে করে আশ্বস্ত হবে যে আমি পুনশ্চ প্রকৃতিস্থ হয়েছি।

খড়দহ, দেওয়ালি, ১৩৩৯

২

অন্তরে যে ভাবটা অনির্বচনীয় তাকে প্রেয়সী নারী প্রকাশ করবে গানে নাচে এটাকে লিরিক বলে স্বীকার করা হয়। এর ভঙ্গীগুলিকে ছন্দের বন্ধনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে; তারা সেই ছন্দের শাসনে পরস্পরকে যথাযথভাবে মেনে চলে বলেই তাদের সুনিয়ন্ত্রিত সম্মিলিত গতিতে একটি শক্তির উদ্ভব হয়, সে আমাদের মনকে প্রবলবেগে আঘাত দিয়ে থাকে। এর জন্যে বিশেষ প্রসাধন আয়োজন বিশেষ রঙ্গমঞ্চের আবশ্যক ঘটে। সে আপনার একটি স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে, একটি দূরত্ব।

কিন্তু একবার সরিয়ে দাও ওই রঙ্গমঞ্চ, জরির আঁচলা দেওয়া বেনারসী শাড়ি তোলা থাক্ পেটিকায়, নাচের বন্ধনে তনুদেহের গতিকে মধুর নিয়মে নাই বা সংযত করলে, তাহলেই কি রস নষ্ট হল? তাহলেও দেহের সহজ ভঙ্গীতে কান্তি আপনি জাগে, বাহুর ভাষায় সে-বেদনার ইঙ্গিত ঠিকরে ওঠে সে মুক্ত বলেই যে নিরর্থক এমন কথা যে বলতে পারে তার রসবোধ অসাড় হয়েছে। সে নাচে না বলেই যে তার চলনে মাধুর্যের অভাব ঘটে কিংবা সে গান করে না বলেই যে তার কানে কানে কথার মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনা থাকে না এ-কথা অশ্রদ্ধেয়। বরঞ্চ এই অনিয়ন্ত্রিত কলায় একটি বিশেষ গুণের বিকাশ হয়, তাকে বলব ভাবের স্বচ্ছন্দতা, আপন আন্তরিক সত্যেই তার আপনার পর্যাপ্তি। তার বাহুল্যবর্জিত আত্মনিবেদনে তার সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কাছের সম্বন্ধ ঘটে। অশোকের গাছে সে আলতা-আঁকা নূপুরশিঞ্জিত পদাঘাত নাই করল; না হয় কোমরে আঁট আঁচল বাঁধা, বাঁ-হাতের কুক্ষিতে ঝুড়ি, ডান হাত দিয়ে মাচা থেকে লাউশাক তুলছে. অযত্নশিথিল খোঁপা ঝুলে পড়েছে আলগা হয়ে; সকালের রৌদ্রজড়িত ছায়াপথে হঠাৎ এই দৃশ্যে কোনো তরুণের বুকের মধ্যে যদি ধক করে ধাক্কা লাগে তবে সেটাকে কি লিরিকের ধাক্কা বলা চলে না—না হয় গদ্য-লিরিকই হল। এ রস শালপাতায় তৈরি গদ্যের পেয়ালাতেই মানায়, ওটাকে তো ত্যাগ করা চলবে না। প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটি স্বচ্ছতা আছে তার মধ্য দিয়ে অতুচ্ছ পড়ে ধরা—গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা। তাই বলে এ-কথা মনে করা ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্যছন্দের মধ্যে আছে। ও যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লবপুঞ্জের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাঁটা সাজানো নয়, অসম তার স্তবকগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য।

প্রশ্ন উঠবে গদ্য তাহলে কাব্যের পর্যায়ে উঠবে কোন্ নিয়মে। এর উত্তর সহজ। গদ্যকে যদি ঘরের গৃহিণী বলে কল্পনা কর, তাহলে জানবে তিনি তর্ক করেন, ধোবার বাড়ির কাপড়ের হিসেব রাখেন, তাঁর কাশি সর্দি জ্বর প্রভৃতি হয়, 'মাসিক বসুমতী' পাঠ করে থাকেন, এ-সমস্তই প্রাত্যহিক হিসেব, সংবাদের কোঠার অন্তর্গত, এই ফাঁকে ফাঁকে মাধুরীর স্রোত উছলিয়ে ওঠে, পাথর ডিঙিয়ে ঝরনার মতো। সেটা সংবাদের বিষয় নয়, সে সংগীতের শ্রেণীয়। গদ্যকাব্যে তাকে বাছাই করে নেওয়া যায় অথবা সংবাদের সঙ্গে সংগীত মিশিয়ে দেওয়া চলে। সেই মিশ্রণের উদ্দেশ্য সংগীতের রসকে পরুষের স্পর্শে ফেনায়িত উগ্রতা দেওয়া। শিশুদের সেটা পছন্দ না হতে পারে কিন্তু দৃঢ়দন্ত বয়স্কের রুচিতে এটা উপাদেয়।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, এই জাতের কবিতায় গদ্যকে কাব্য হতে হবে। গদ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাব্য পর্যন্ত পৌঁছল না এটা শোচনীয়। দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় যদি কেবল স্বর্গীয় পালোয়ানের আদর্শ হতেন তাহলে শুম্ভনিশুম্ভের চেয়ে উপরে উঠতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর পৌরুষ যখন কমনীয়তার সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখনই তিনি দেব-সাহিত্যে গদ্যকাব্যের সিংহাসনের উপযুক্ত হন। (দোহাই তোমার, বাংলাদেশের ময়ূরে-চড়া কার্তিকটিকে সম্পূর্ণ ভোলবার চেষ্টা কোরো)।

১৭ মে ১৯৩৫

কাব্য ও ছন্দ

গদ্যকাব্য নিয়ে সন্দিগ্ধ পাঠকের মনে তর্ক চলছে। এতে আশ্চর্যের বিষয় নেই।

ছন্দের মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের অভিঘাতে রসগর্ভ বাক্য সহজে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, মনকে দুলিয়ে তোলে—এ কথা স্বীকার করতে হবে।

শুধু তাই নয়। যে-সংসারের ব্যবহারে গদ্য নানা বিভাগে নানা কাজে খেটে মরছে কাব্যের জগৎ তার থেকে পৃথক। পদ্যের ভাষা-বিশিষ্টতা এই কথাটাকে স্পষ্ট করে; স্পষ্ট হলেই মনটা তাকে স্বক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারে। গেরুয়া-বেশে সন্ন্যাসী জানান দেয় সে গৃহীর থেকে পৃথক, ভক্তের মন সেই মুহূর্তেই তার পায়ের কাছে এগিয়ে আসে—নইলে সন্ন্যাসীর ভক্তির ব্যবসায়ে ক্ষতি হবার কথা।

কিন্তু বলা বাহুল্য সন্ন্যাসধর্মের মুখ্য তত্ত্বটা তার গেরুয়া কাপড়ে নয় সেটা আছে তার সাধনার সত্যতায়। এই কথাটা যে বোঝে, গেরুয়া কাপড়ের অভাবেই তার মন আরো বেশি করে আকৃষ্ট হয়। সে বলে আমার বোধশক্তির দ্বারাই সত্যকে চিনব, সেই গেরুয়া কাপড়ের দ্বারা নয় যে-কাপড় বহু অসত্যকে চাপা দিয়ে রাখে।

ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে, ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় তার আনুষঙ্গিক হয়ে।

সহায়তা করে দুই দিক থেকে। এক হচ্ছে স্বভাবতই তার দোলা দেবার শক্তি আছে, আর এক হচ্ছে পাঠকের চিরাভ্যস্ত সংস্কার। এই সংস্কারের কথাটা ভাববার বিষয়। একদা নিয়মিত অংশে বিভক্ত ছন্দই সাধু কাব্যভাষায় একমাত্র পাংক্তেয় বলে গণ্য ছিল। সেই সময়ে

আমাদের কানের অভ্যাসও ছিল তার অনুকূলে। তখন ছন্দে মিল রাখাও ছিল অপরিহার্য।

এমন সময়ে মধুস্থদন বাংলা সাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রতিকূলে আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাতে রইল না মিল। তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমানভাগে সাজানো বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে। অর্থাৎ এর ভঙ্গী পদ্যের মতো কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে।

সংস্কারের অনিত্যতার আর-একটা প্রমাণ দিই। একসময়ে কুলবধূর সংজ্ঞা ছিল, সে অন্তঃপুরচারিণী। প্রথম যে-কুলস্ত্রীরা অন্তঃপুর থেকে অসংকোচে বেরিয়ে এলেন তাঁরা সাধারণের সংস্কারকে আঘাত করাতে তাঁদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা ও অপ্রকাশ্যে বা প্রকাশ্যে অপমানিত করা, প্রহসনের নায়িকারূপে তাঁদেরকে অট্টহাস্যের বিষয় করা প্রচলিত হয়ে এসেছিল। সেদিন যে-মেয়েরা সাহস ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষ-ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে পাঠ নিতেন তাঁদের সম্বন্ধে কাপুরুষ আচরণের কথা জানা আছে।

ক্রমশই সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়ে আসছে। কুলস্ত্রীরা আজ অসংশয়িত-ভাবে কুলস্ত্রীই আছেন যদিও অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে তাঁরা মুক্ত।

তেমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিলবর্জিত অসমানতাকে কেউ কাব্যরীতির বিরোধী বলে আজ মনে করেন না। অথচ পূর্বতন বিধানকে এই ছন্দ বহুদূরে লঙ্ঘন করে গেছে।

কাজটা সহজ হয়েছিল কেননা তখনকার ইংরেজি-শেখা পাঠকেরা মিল্‌টন-শেক্‌স্‌পীয়রের ছন্দকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দকে জাতে তুলে নেবার প্রসঙ্গে সাহিত্যিক সনাতনীরা এই কথা বলবেন যে, যদিও এই ছন্দ চোদ্দ অক্ষরের গণ্ডিটা পেরিয়ে চলে তবু সে পয়ারের লয়টাকে অমান্য করে না।

অর্থাৎ লয়কে রক্ষা করার দ্বারা এই ছন্দ কাব্যের ধর্ম রক্ষা করেছে, অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে এইটুকু বিশ্বাস লোকে আঁকড়ে রয়েছে। তারা বলতে চায় পয়ারের সঙ্গে এই নাড়ীর সম্বন্ধটুকু না থাকলে কাব্য কাব্যই হতে পারে না। কী হতে পারে এবং হতে পারে না তা হওয়ার উপরেই নির্ভর করে, লোকের অভ্যাসের উপর করে না—এ-কথাটা অমিত্রাক্ষর ছন্দই পূর্বেই প্রমাণ করেছে। আজ গদ্যকাব্যের উপরে প্রমাণের ভার পড়েছে যে গদ্যেও কাব্যের সঞ্চরণ অসাধ্য নয়।

অশ্বারোহী সৈন্যও সৈন্য আবার পদাতিক সৈন্যও সৈন্য – কোন্‌খানে তাদের মূলগত মিল? যেখানে লড়াই ক'রে জেতাই তাদের উভয়েরই সাধনার লক্ষ্য।

কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা,—পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে। হার হলেই হার, তা সে ঘোড়ায় চড়েই হোক আর পায়ে হেঁটেই হোক। ছন্দে-লেখা রচনা কাব্য হয় নি তার হাজার প্রমাণ আছে, গদ্যরচনাও কাব্য নাম ধরলেও কাব্য হবে না তার ভূরি ভূরি প্রমাণ জুটতে থাকবে।

ছন্দের একটা সুবিধা এই যে ছন্দের স্বতই একটা মাধুর্য আছে, আর কিছু না হয় তো সেটাই একটা লাভ। সস্তা সন্দেশে ছানার অংশ নগণ্য হতে পারে কিন্তু অন্তত চিনিটা পাওয়া যায়।

কিন্তু সহজে সন্তুষ্ট নয় এমন একগুঁয়ে মানুষ আছে, যারা চিনি দিয়ে আপনাকে ভোলাতে লজ্জা পায়। মনভোলানো মালমসলা বাদ দিয়েও, কেবলমাত্র খাঁটি মাল দিয়েই তারা জিতবে এমনতরো তাদের জিদ। তারা এই কথাই বলতে চায় আসল কাব্য জিনিসটা একান্তভাবে ছন্দ-অছন্দ নিয়ে নয়, তার গৌরব তার আন্তরিক সার্থকতায়।

গদ্যই হোক পদ্যই হোক রসরচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা-নিয়মের পথে চলতে পারে কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্য-ছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারাত্মক বিপদ ঘটে, আপনি এসে পড়ে অসতর্কতা। অসতর্কতাই অপমান করে কলালক্ষ্মীকে, আর কলালক্ষ্মী তার শোধ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে। অসতর্ক লেখকদের হাতে গদ্য-কাব্য অবজ্ঞা ও পরিহাসের উপাদান স্তূপাকার করে তুলবে এমন আশঙ্কার কারণ আছে। কিন্তু এই সহজ কথাটা বলতেই হবে যেটা যথার্থ কাব্য সেটা পদ্য হলেও কাব্য গদ্য হলেও কাব্য।

সবশেষে এই একটি কথা বলবার আছে: কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যতদূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।

বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয়সাধনে গদ্য কাজে লাগবে; কেননা গদ্য শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়।

১২ নভেম্বর ১৯৩৬

গদ্যকাব্য

কতকগুলি বিষয় আছে যার আবহাওয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম, কিছুতেই সহজে প্রতিভাত হতে চায় না। ধরাছোঁওয়ার বিষয় নিয়ে তর্কে আঘাত-প্রতিঘাত করা চলে। কিন্তু বিষয়বস্তু যখন অনির্বচনীয়ের কোঠায় এসে পড়ে তখন কী উপায়ে বোঝানো চলে তা দ্বন্দ্ব কি-না। তাকে ভালো-লাগা মন্দ-লাগার একটা সহজ ক্ষমতা ও বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে হলে সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু রুচি এমন একটা জিনিস যাকে বলা যেতে পারে সাধনদুর্লভ, তাকে পাওয়ার বাঁধা-পথ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। সহজ ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী বলতে পারি যে এই আমার ভালো লাগে।

সেই রুচির সঙ্গে যোগ দেয় নিজের স্বভাব, চিন্তার অভ্যাস, সমাজের পরিবেষ্টন ও শিক্ষা। এগুলি যদি ভদ্র, ব্যাপক ও সূক্ষ্মবোধশক্তিমান হয় তাহলে সেই রুচিকে সাহিত্যপথের আলোক ব'লে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু রুচির শুভসম্মিলন কোথাও সত্য পরিণামে পৌঁছেছে কিনা তাও মেনে নিতে অন্য পক্ষে রুচিচর্চার সত্য আদর্শ থাকা চাই। সুতরাং রুচিগত বিচারের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে যুগে যুগে তার প্রমাণ পেয়ে আসছি। বিজ্ঞান-দর্শন সম্বন্ধে যে-মানুষ যথোচিত চর্চা করে নি সে বেশ নম্রভাবেই বলে, মতের অধিকার নেই আমার। সাহিত্য ও শিল্পে রসসৃষ্টির সভায় মতবিরোধের কোলাহল দেখে অবশেষে হতাশ হয়ে বলতে ইচ্ছে হয়, ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। সেখানে সাধনার বালাই নেই ব'লে স্পর্ধা আছে অবারিত, আর সেইজন্যেই রুচিভেদের তর্ক নিয়ে হাতাহাতিও হয়ে থাকে। তাই বররুচির আক্ষেপ মনে পড়ে, অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।

স্বয়ং কবির কাছে অধিকারীর ও অনধিকারীর প্রসঙ্গ সহজ। তাঁর লেখা কার ভালো লাগল কার লাগল না শ্রেণীভেদ এই যাচাই নিয়ে। এই কারণেই চিরকাল ধরে যাচনদারের সঙ্গে শিল্পীদের ঝগড়া চলেছে। স্বয়ং কবি কালিদাসকেও এ নিয়ে দুঃখ পেতে হয়েছে সন্দেহ নেই ; শোনা যায় নাকি মেঘদূতে স্থূলহস্তাবলেপের প্রতি ইঙ্গিত আছে। যে-সকল কবিতায় প্রথাগত ভাষা ও ছন্দের অনুসরণ করা হয় সেখানে অন্তত বাইরের দিক থেকে পাঠকদের চলতে ফিরতে বাধে না। কিন্তু কখনো কখনো বিশেষ কোনো রসের অনুসন্ধানে কবি অভ্যাসের পথ অতিক্রম করে থাকে। তখন অন্তত কিছুকালের জন্য পাঠকের আরামের ব্যাঘাত ঘটে ব'লে তারা নূতন রসের আমদানিকে অস্বীকার ক'রে শাস্তি জ্ঞাপন করে। চলতে চলতে যে-পর্যন্ত পথ চিহ্নিত হ'য়ে না যায় সে-পর্যন্ত পথকর্তার বিরুদ্ধে পথিকদের একটা ঝগড়ার সৃষ্টি হয়ে ওঠে। সেই অশান্তির সময়টাতে কবি স্পর্ধা প্রকাশ করে, বলে তোমাদের চেয়ে আমার মতই প্রামাণিক। পাঠকরা বলতে থাকে, যে-লোকটা জোগান দেয় তার চেয়ে যে-লোক ভোগ করে তারই দাবির জোর বেশি। কিন্তু ইতিহাসে তার প্রমাণ হয় না। চিরদিনই দেখা গেছে নূতনকে উপেক্ষা করতে করতেই নূতনের অভ্যর্থনার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

কিছুদিন থেকে আমি কোনো কোনো কবিতা গদ্যে লিখতে আরম্ভ করেছি। সাধারণের কাছ থেকে এখনই যে তা সমাদর লাভ করবে এমন প্রত্যাশা করা অসংগত। কিন্তু সদ্য সমাদর না পাওয়াই যে তার নিষ্ফলতার প্রমাণ তাও মানতে পারি নে। এই দ্বন্দ্বের স্থলে আত্মপ্রত্যয়কে সম্মান করতে কবি বাধ্য। আমি অনেকদিন ধরে রসসৃষ্টির সাধনা করেছি, অনেককে হয়তো আনন্দ দিতে পেরেছি, অনেককে হয়তো বা দিতে পারি নি। তবু এই বিষয়ে আমার বহুদিনের সঞ্চিত যে

অভিজ্ঞতা তার দোহাই দিয়ে দুটো-একটা কথা বলব, আপনারা তা সম্পূর্ণ মেনে নেবেন এমন কোনো মাথার দিব্য নেই।

তর্ক এই চলেছে গদ্যের রূপ নিয়ে কাব্য আত্মরক্ষা করতে পারে কি না। এতদিন যে-রূপেতে কাব্যকে দেখা গেছে, এবং সে-দেখার সঙ্গে আনন্দের যে অনুষঙ্গ, তার ব্যতিক্রম হয়েছে গদ্যকাব্যে। কেবল প্রসাধনের ব্যত্যয় নয়, স্বরূপেতে তার ব্যাঘাত ঘটেছে। এখন তর্কের বিষয় এই যে, কাব্যের স্বরূপ ছন্দোবদ্ধ সজ্জার 'পরে একান্ত নির্ভর করে কি না। কেউ মনে করেন করে, আমি মনে করি করে না। অলংকরণের বহিরাবরণ থেকে মুক্ত ক'রে কাব্য সহজে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে, এ-বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেব। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, জবালা-পুত্র সত্যকামের কাহিনী অবলম্বন ক'রে আমি একটি কবিতা রচনা করেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্পটি সহজ গদ্যের ভাষায় পড়েছিলাম, তখন তাকে সত্যিকার কাব্য ব'লে মেনে নিতে একটুও বাধে নি। উপাখ্যানমাত্র—কাব্যবিচারক একে বাহিরের দিকে তাকিয়ে কাব্যের পর্যায়ে স্থান দিতে অসম্মত হতে পারেন; কারণ এ তো অনুষ্টুভ, ত্রিষ্টুভ বা মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয় নি। আমি বলি হয় নি ব'লেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হতে পেরেছে, অপর কোনো আকস্মিক কারণে নয়। এই সত্যকামের গল্পটি যদি ছন্দে বেঁধে রচনা করা হত, তবে হালকা হয়ে যেত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে নাম-না-জানা কয়েকজন লেখক ইংরেজিতে গ্রীক ও হিব্রু বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন। এ-কথা মানতেই হবে যে সলোমনের গান ডেভিডের গাথা সত্যিকার কাব্য। এই অনুবাদের ভাষার আশ্চর্য শক্তি এদের মধ্যে কাব্যের রস ও রূপকে নিঃসংশয়ে পরিস্ফুট করেছে। এই গানগুলিতে গদ্যছন্দের যে মুক্ত পদক্ষেপ আছে, তাকে যদি পদ্যপ্রথার শিকলে বাঁধা হত তবে সর্বনাশই হত।

যজুর্বেদে যে উদাত্ত ছন্দের সাক্ষাৎ আমরা পাই, তাকে আমরা পদ্য বলি না, বলি মন্ত্র। আমরা সবাই জানি যে, মন্ত্রের লক্ষ্য হল শব্দের অর্থকে ধ্বনির ভিতর দিয়ে মনের গভীরে নিয়ে যাওয়া। সেখানে সে যে কেবল অর্থবান তা নয়, ধ্বনিমানও বটে। নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এই গদ্যমন্ত্রের সার্থকতা অনেকে মনের ভিতর অনুভব করেছেন কারণ তার ধ্বনি থামলেও অনুরণন থামে না।

একদা কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে আমি আমার গীতাঞ্জলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করি। সেদিন বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিকেরা আমার অনুবাদকে তাঁদের সাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করলেন। এমন কি, ইংরেজি গীতাঞ্জলিকে উপলক্ষ্য ক'রে এমন সব প্রশংসাবাদ করলেন যাকে অত্যুক্তি মনে করে আমি কুণ্ঠিত হয়েছিলাম। আমি বিদেশী, আমার কাব্যে মিল বা ছন্দের কোনো চিহ্নই ছিল না, তবু যখন তাঁরা তার ভিতর সম্পূর্ণ কাব্যের রস পেলেন, তখন সে-কথা তো স্বীকার না করে পারা গেল না। মনে হয়েছিল ইংরেজি গদ্যে আমার কাব্যের রূপ দেওয়ায় ক্ষতি হয় নি, বরঞ্চ পদ্যে অনুবাদ করলে হয়তো তা ধিকৃকৃত হত, অশ্রদ্ধেয় হত।

মনে পড়ে একবার শ্রীমান সত্যেন্দ্রকে বলেছিলুম, "ছন্দের রাজা তুমি, অ-ছন্দের শক্তিতে কাব্যের স্রোতকে তার বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত করো দেখি।" সত্যেনের মতো বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা বাংলায় খুব কমই আছে। হয়তো অভ্যাস তাঁর পথে বাধা দিয়েছিল, তাই তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। আমি স্বয়ং এই কাব্য রচনার চেষ্টা করেছিলুম লিপিকায়, অবশ্য পদ্যের মতো পদ ভেঙে দেখাই নি। লিপিকা লেখার পর বহুদিন আর গদ্যকাব্য লিখি নি। বোধ করি সাহস হয় নি ব'লেই।

কাব্যভাষার একটা ওজন আছে, সংযম আছে, তাকেই বলে ছন্দ।

গদ্যের বাছবিচার নেই, সে চলে বুক ফুলিয়ে। সেজন্যেই রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি প্রাত্যহিক ব্যাপার প্রাঞ্জল গদ্যে লেখা চলতে পারে। কিন্তু গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়। তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত। গদ্য বলেই এর ভিতরে অতিমাধুর্য অতিলালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না। কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতির আপনাআপনি উদ্ভব হয়। নটীর নাচে শিক্ষিতপটু অলংকৃত পদক্ষেপ। অপর পক্ষে ভালো চলে এমন কোনো তরুণীর চলনে ওজন-রক্ষার একটি স্বাভাবিক নিয়ম আছে। এই সহজ সুন্দর চলার ভঙ্গীতে একটা অশিক্ষিত ছন্দ আছে, যে ছন্দ তার রক্তের মধ্যে, যে ছন্দ তার দেহে। গদ্যকাব্যের চলন হল সেইরকম—অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল গতি নয়, সংযত পদক্ষেপ।

আজকেই মোহাম্মদী পত্রিকায় দেখছিলুম কে একজন লিখেছেন যে, রবিঠাকুরের গদ্যকবিতার রস তিনি তাঁর সাদা গদ্যেই পেয়েছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ লেখক বলেছেন যে 'শেষের কবিতা'য় মূলত কাব্যরসে অভিষিক্ত জিনিস এসে গেছে। তাই যদি হয় তবে কি জেনানা থেকে বার হবার জন্যে কাব্যের জাত গেল? এখানে আমার প্রশ্ন এই, আমরা কি এমন কাব্য পড়ি নি যা গদ্যের বক্তব্য বলেছে, যেমন ধরুন ব্রাউনিঙে? আবার ধরুন এমন গদ্যও কি পড়ি নি যার মাঝখানে কবিকল্পনার রেশ পাওয়া গেছে? গদ্য ও পদ্যের ভাসুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক আমি মানি না। আমার কাছে তারা ভাই আর বোনের মতো, তাই যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদানপ্রদান হচ্ছে, তখন আমি আপত্তি করি নে।

রুচিভেদ নিয়ে তর্ক করে কিছু লাভ হয় না। এইমাত্রই বলতে পারি আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ

করতে পারতুম না। তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে; হয়তো সজ্জা নেই, কিন্তু রূপ আছে এবং এইজন্যেই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় ব'লে মনে করি। কথা উঠতে পারে গদ্যকাব্য কী। আমি বলব কী ও কেমন জানি না, জানি যে, এর কাব্যরস এমন একটা জিনিস যা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার নয়। যা আমাকে বচনাতীতের আস্বাদ দেয় তা গদ্য বা পদ্যরূপেই আসুক তাকে কাব্য ব'লে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হব না।

শান্তিনিকেতন, ২৯ আগস্ট, ১৯৩৯

সাহিত্য-বিচার

…সূক্ষ্মদৃষ্টি জিনিসটা যে রস আহরণ করে সেটা সকল সময় সার্বজনিক হয় না। সাহিত্যের এটাই হল অপরিহার্য দৈন্য। তাকে পুরস্কারের জন্য নির্ভর করতে হয় ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপরে। তার নিম্ন-আদালতের বিচার সেও যেমন বৈজ্ঞানিক বিধি-নির্দিষ্ট নয়, তার আপিল-আদালতের রায়ও তথৈবচ। এস্থলে আমাদের প্রধান নির্ভরের বিষয় বহুসংখ্যক শিক্ষিত রুচির অনুমোদনে। কিন্তু কে না জানে যে শিক্ষিত লোকের রুচির পরিধি তৎকালীন বেষ্টনীর দ্বারা সীমাবদ্ধ, সময়ান্তরে তার দশান্তর ঘটে। সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি একটা সজীব পদার্থ। কালক্রমে সেটা বাড়ে এবং কমে, কৃশ হয় এবং স্থূল হয়েও থাকে। তার সেই নিত্যপরিবর্তমান পরিমাণবৈচিত্র্য দিয়েই সে সাহিত্যকে বিচার করতে বাধ্য, আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু বিচারকেরা সেই হ্রাসবৃদ্ধিকে অনিত্য বলে স্বীকার করেন না—তাঁরা বৈজ্ঞানিক ভঙ্গী নিয়ে নির্বিকার অবিচলতার ভান করে থাকেন। কিন্তু এ বিজ্ঞান মেকি বিজ্ঞান, খাঁটি নয়, ঘরগড়া বিজ্ঞান, শাশ্বত নয়। উপস্থিতমতো যখন একজন বা এক সম্প্রদায়ের লোক সাহিত্যিকের উপরে কোনো মত জাহির করেন, তখন সেই ক্ষণিক চলমান আদর্শের অনুসারে সাহিত্যিকের দণ্ডপুরস্কারের ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে থাকে। তার বড়ো আদালত নেই, তার ফাঁসির দণ্ড হলেও সে একান্ত মনে আশা করে যে বেঁচে থাকতে থাকতে হয়তো ফাঁস যাবে ছিঁড়ে, গ্রহের গতিকে কখনো যায়, কখনো যায় না। সমালোচনার এই অধ্রুব অনিশ্চয়তা থেকে স্বয়ং শেক্‌স্‌পীয়রও নিষ্কৃতি লাভ করেন নি। পণ্যের মূল্যনির্ধারণ-কালে ঝগড়া করে তর্ক করে কিংবা আর পাঁচজনের নজির তুলে তার সমর্থন করা জলের উপর ভিত গাড়া। জল তো স্থির নয়, মানুষের রুচি

স্থির নয়, কাল স্থির নয়। এস্থলে ধ্রুব আদর্শের ভান না করে সাহিত্যের পরিমাপ যদি সাহিত্য দিয়েই করা যায় তাহলে শান্তি রক্ষা হয়। অর্থাৎ জজের রায় স্বয়ং যদি শিল্প-নিপুণ হয় তাহলে মানদণ্ডই সাহিত্যভাণ্ডারে সসম্মানে রক্ষিত হবার যোগ্য হতে পারে।

সাহিত্যবিচারমূলক গ্রন্থ পড়বার সময় প্রায়ই কমবেশি পরিমাণে যে জিনিসটি চোখে পড়ে, সে হচ্ছে বিচারকের বিশেষ সংস্কার ; এই সংস্কারের প্রবর্তনা ঘটে তাঁর দলের সংস্রবে, তাঁর শ্রেণীর টানে, তাঁর শিক্ষার বিশেষত্ব নিয়ে। কেউ এ প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন না। বলা বাহুল্য এ সংস্কার জিনিসটা সর্বকালের আদর্শের নির্বিশেষ অনুবর্তী নয়। জজের মনে ব্যক্তিগত সংস্কার থাকেই কিন্তু তিনি আইনের দণ্ডের সাহায্যে নিজেকে খাড়া রাখেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে এই আইন তৈরি হতে থাকে বিশেষ কালের বা বিশেষ দলের, বিশেষ শিক্ষার বা বিশেষ ব্যক্তির তাড়নায়। এ আইন সর্বজনীন এবং সর্বকালের হতে পারে না। সেইজন্যেই পাঠকসমাজে বিশেষ বিশেষ কালে এক-একটা বিশেষ মরসুম দেখা দেয়, যথা টেনিসনের মরসুম, কিপলিঙের মরসুম। এমন নয় যে ক্ষুদ্র একটা দলের মনেই সেটা ধাক্কা মারে, বৃহৎ জনসংঘ এই মরসুমের দ্বারা চালিত হতে থাকে, অবশেষে কখন্ একসময় ঋতু-পরিবর্তন হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক সত্য বিচারে এ-রকম ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব কেউ প্রশ্রয় দেয় না। এই বিচারে আপন বিশেষ সংস্কারের দোহাই দেওয়াকে বিজ্ঞানে মূঢ়তা বলে। অথচ সাহিত্যে এই ব্যক্তিগত ছোঁয়াচ লাগাকে কেউ তেমন নিন্দা করে না। সাহিত্যে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ সেটা অধিকাংশ স্থলেই যোগ্য বা অযোগ্য বিচারকের বা তার সম্প্রদায়ের আশ্রয় নিয়ে আপনাকে ঘোষণা করে। বর্তমানকালে বিত্তাল্পতার মমত্ব বা অহংকার সর্বজনীন আদর্শের ভান করে দণ্ডনীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা

করছে। এও যে অনেকটা বিদেশী নকলের ছোঁয়াচ-লাগা মরসুম হতে পারে, পক্ষপাতী লোকে এটা স্বীকার করতে পারেন না। সাহিত্যে এই রকম বিচারকের অহংকার ছাপার অক্ষরের বত্রিশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অবশ্য যারা শ্রেণীগত বা দলগত বা বিশেষকালগত মমত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত নয় তাদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত। কিন্তু তারা যে কে তা কে স্থির করবে, যে সরষে দিয়ে ভূত ঝাড়ায় সে সরষেকেই ভূতে পায়। আমরা বিচারকের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করি নিজের মতের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে। মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভান না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা। সে-রকম সাহিত্য মতের একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায় না। তার মূল্য তার সাহিত্যরসেই।

সমালোচকদের লেখায় কটাক্ষে এমন আভাস পেয়ে থাকি যেন আমি অন্তত কোথাও কোথাও আধুনিকের পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার কাঁচা চেষ্টা করছি এবং সেটা আমার কাব্যের স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাচ্ছে না। এই উপলক্ষে এ-সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলে নিই।

আমার মনে আছে যখন আমি ক্ষণিকা লিখেছিলেম, তখন একদল পাঠকের ধাঁধাঁ লেগেছিল। তখন যদি আধুনিকের রেওয়াজ থাকত তাহলে কারো বলতে বাধত না যে ওই সব লেখায় আমি আধুনিকের সাজ পরতে শুরু করেছি। মানুষের বিচারবুদ্ধির ঘাড়ে তার ভূতগত সংস্কার চেপে বসে। মনে আছে কিছুকাল পূর্বে কোনো সমালোচক লিখেছিলেন, হাস্যরস আমার রচনা-মহলের বাইরের জিনিস। তাঁর মতে সেটা হতে বাধ্য কেননা লিরিক কবিদের মধ্যে স্বভাবতই হাস্যরসের অভাব থাকে। তৎসত্ত্বেও আমার 'চিরকুমারসভা' ও অন্যান্য প্রহসনের উল্লেখ তাঁকে করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর মতে তার হাস্যরসটা অগভীর, কারণ—কারণ আর কিছু বলতে হবে না, কারণ তাঁর সংস্কার, যে সংস্কার যুক্তিতর্কের অতীত। ··

আমি অনেক সময় খুঁজি সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ কার হাল ডাইনে বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি করে না। একজনের নাম খুব বড়ো করে আমার মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথর নাম আমার বিশেষ করে মনে আসবার কারণ এই যে, আমি তাঁর কাছে ঋণী। সাহিত্যে ঋণ গ্রহণ করবার ক্ষমতাকে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করা যেতে পারে। যারা গ্রহণ করতে এবং স্বীকার করতে পারে নি অনেককাল পর্যন্ত তাদের আমি অশ্রদ্ধা করে এসেছি। তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়—এই মননধর্ম মনের সে তুঙ্গশিখরেই অনাবৃত থাকে যেটা ভাবালুতার বাষ্প-স্পর্শহীন। তাঁর মনের সচেতনতা আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন তাহলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পেত। এত বেশি নির্বিকার তাঁর মন যে, বাঙালী পাঠক অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করতেই পারে নি। মুশকিল এই যে বাঙালী কাউকে কোনো একটা দলে না টানলে তাকে বুঝতেই পারে না। আমার নিজের কথা যদি বল, সত্য-আলোচনাসভায় আমার উক্তি অলংকারের ঝংকারে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ-কথাটা অত্যন্ত বেশি জানা হয়ে গেছে, সেজন্য আমি লজ্জিত এবং নিরুত্তর। অতএব সমালোচনার আসরে আমার আসন থাকতেই পারে না। কিন্তু রসের অসংযম প্রমথ চৌধুরীর লেখায় একেবারেই নেই। এই সকল গুণেই মনে মনে তাঁকে জজের পদে বসিয়েছিলুম। কিন্তু বুঝতে পারছি বিলম্ব হয়ে গেছে। তার বিপদ এই যে, সাহিত্যে অরক্ষিত আসনে যে খুশি সেই চড়ে বসে। তার ছত্রদণ্ড ধরবার লোক পিছনে পিছনে জুটে যায়।

এখানেই আমার শেষ কথাটা বলে নিই। আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান ক'রে পান নি ব'লে নালিশ করেন তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার সময় এল। পলিমাটি কোনো স্থায়ী কীর্তির ভিত বহন করতে পারে না। বাংলার গাঙ্গেয় প্রদেশে এমন কোনো সৌধ পাওয়া যায় না যা প্রাচীনতার স্পর্ধা করতে পারে। এদেশের আভিজাত্য সেই শ্রেণীর। আমরা যাদের বনেদিবংশীয় বলে আখ্যা দিই তাদের বনেদ বেশি নিচে পর্যন্ত পৌঁছয় নি। এরা অল্পকালের পরিসরের মধ্যে মাথা তুলে ওঠে তার পরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে বিলম্ব করে না। এই আভিজাত্য সেইজন্য একটা আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। তার সেই ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্যকে বেশি উচ্চে স্থাপন করা বিড়ম্বনা, কেননা সেই কৃত্রিম উচ্চতা কালের বিদ্রূপের লক্ষ্য হয় মাত্র। এই কারণে আমাদের দেশের অভিজাতবংশ তার মনোবৃত্তিতে সাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হতে পারে না। এ-কথা সত্য এই স্বল্পকালীন ধনসম্পদের আত্মসচেতনতা অনেক সময়েই দুঃসহ অহংকারের সঙ্গে আপনাকে জনসম্প্রদায় থেকে পৃথক রাখবার আড়ম্বর করে। এই হাস্যকর বক্ষস্ফীতি আমাদের বংশে অন্তত আমাদের কালে একেবারেই ছিল না। কাজেই আমরা কোনোদিন বড়লোকের প্রহসন অভিনয় করি নি। অতএব আমার মনে যদি কোনো স্বভাবগত বিশেষত্বের ছাপ পড়ে থাকে তা বিত্তপ্রাচুর্য কেন বিত্তসচ্ছলতারও নয়। তাকে বিশেষ পরিবারের পূর্বাপর সংস্কৃতির মধ্যে ফেলা যেতে পারে এবং এ-রকম স্বাতন্ত্র্য হয়তো অন্য পরিবারেও কোনো বংশগত অভ্যাসবশত আত্মপ্রকাশ করে থাকে। বস্তুত এটা আকস্মিক। আশ্চর্য এই যে, সাহিত্যে এই মধ্যবিত্ততার অভিমান সহসা অত্যন্ত মেতে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে "তরুণ" শব্দটা এইরকম ফণা তুলে ধরেছিল। আমাদের দেশে সাহিত্যে এইরকম জাতে ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়েছে হালে। আমি

যখন মস্কৌ গিয়েছিলুম, চেকভের রচনা সম্বন্ধে আমার অনুকূল অভিরুচি ব্যক্ত করতে গিয়ে হঠাৎ ঠোক্কর খেয়ে দেখলুম, চেকভের লেখায় সাহিত্যের মেলবন্ধনে জাতিচ্যুতিদোষ ঘটেছে সুতরাং তাঁর নাটক স্টেজের মঞ্চে পংক্তি পেল না। সাহিত্যে এই মনোভাব এত বেশি কৃত্রিম যে শুনতে পাই এখন আবার হাওয়া বদল হয়েছে। একসময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয় একসময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য ব'লে অস্পৃশ্য হবে। এখনই যখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে তাই ভয় হয় এর আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।

কিছুকাল থেকে আমি দুঃসহ রোগদুঃখ ভোগ করে আসছি। সেইজন্য যদি ব'লে বসি যাঁরা আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত তাঁরাও মুখে কালো রঙ মেখে অস্বাস্থ্যের বিকৃত চেহারা ধারণ করে এলে তবেই সেটা আমার পক্ষে আরামের হতে পারে, তাহলে মনোবিকারের আশঙ্কা কল্পনা করতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে একটা নির্মল প্রসন্নতা আছে। ব্যক্তিগত জীবনে অবস্থার বিপ্লব ঘটে, কিন্তু তাতে এই বিশ্বজনীন দানের মধ্যে বিকৃতি ঘটে না, সেই আমাদের সৌভাগ্য। তাতে যদি আপত্তি করার একটা দল পাকাই তাহলে বলতে হয় যাঁরা নিঃস্ব তাঁদের জন্যে মরুভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করা উচিত, নইলে তাঁদের মনের তুষ্টি অসম্ভব। নিঃস্ব শ্রেণীর পাঠকদের জন্য সাহিত্যেও কি মরু-উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে?···

শান্তিনিকেতন, ১৩৪৭

সাহিত্যের মূল্য

সেদিন অনিলের সঙ্গে সাহিত্যের মূল্যের আদর্শের নিরন্তর পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেম; সেই সঙ্গে বলেছিলেম যে ভাষা সাহিত্যের বাহন, কালে কালে সেই ভাষার রূপান্তর ঘটতে থাকে। সেজন্য তার ব্যঞ্জনার অন্তরঙ্গতার কেবলই তারতম্য ঘটতে থাকে। কথাটা আর-একটু পরিষ্কার করে বলা আবশ্যক।

আমার মতো গীতিকবিরা তাদের রচনায় বিশেষভাবে রসের অনির্বচনীয়তা নিয়ে কারবার করে থাকে। যুগে যুগে লোকের মুখে এই রসের স্বাদ সমান থাকে না, তার আদরের পরিমাণ ক্রমশই শুষ্কনদীর জলের মতো তলায় গিয়ে ঠেকে। এইজন্য রসের ব্যবসা সর্বদা ফেল হবার মুখেই থেকে যায়। তার গৌরব নিয়ে গর্ব করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এই রসের অবতারণা সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন নয়। তার আর-একটা দিক আছে যেটা রূপের সৃষ্টি। যেটাতে আনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, কেবলমাত্র অনুমান নয়, আভাস নয়, ধ্বনির ঝংকার নয়। বাল্যকালে একদিন আমার কোনো বইয়ের নাম দিয়েছিলেম 'ছবি ও গান'। ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই দুটি নামের দ্বারাই সমস্ত সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করা যায়। ছবি জিনিসটা অতিমাত্রায় গূঢ় নয়—তা স্পষ্ট দৃশ্যমান। তার সঙ্গে রস মিশ্রিত থাকলেও তার রেখা ও বর্ণবিন্যাস সেই রসের প্রলেপে ঝাপসা হয়ে যায় না। এইজন্য তার প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমরা মানুষের ভাবের আকৃতি অনেক পেয়ে থাকি এবং তা ভুলতেও বেশি সময় লাগে না। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে মানুষের মূর্তি যেখানে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে সেখানে ভোলবার পথ থাকে না। এই গতিশীল জগতে যা কিছু চলছে ফিরছে তারই মধ্যে

বড়ো রাজপথ দিয়ে সে চলাফেরা করে বেড়ায়। সেই কারণে শেক্স্‌পীয়রের লুক্রিস এবং ভিনস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিস-এর কাব্যের স্বাদ আমাদের মুখে আজ রুচিকর না হতে পারে—সে-কথা সাহস করে বলি বা না বলি; কিন্তু লেডী ম্যাকবেথ অথবা কিং লীয়র অথবা অ্যাণ্টনি ও ক্লিয়োপেট্রা এদের সম্বন্ধে এমন কথা যদি কেউ বলে তাহলে বলব তার রসনায় অস্বাস্থ্যকর বিকৃতি ঘটেছে, সে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। শেক্স্‌পীয়র মানবচরিত্রের চিত্রশালার দ্বারোদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন, সেখানে যুগে যুগে লোকের ভিড় জমা হবে। তেমনি বলতে পারি কুমারসম্ভবের হিমালয়-বর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিম। তাতে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিমর্যাদা হয়তো আছে তার রূপের সত্যতা একেবারেই নেই। কিন্তু সখীপরিবৃতা শকুন্তলা চিরকালের। তাকে দুষ্মন্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারেন কিন্তু কোনো যুগের পাঠকই পারেন না। মানুষ উঠেছে জেগে, মানুষের অভ্যর্থনা সকল কালে ও সকল দেশেই সে পাবে। তাই বলছি সাহিত্যের আসরে এই রূপসৃষ্টির আসন ধ্রুব। কবিকঙ্কণের সমস্ত বাক্যরাশি কালে কালে অনাদৃত হতে পারে কিন্তু রইল তার ভাঁড়ুদত্ত। মিডসামার নাইট্‌স্‌ ড্রীম নাট্যের মূল্য কমে যেতে পারে কিন্তু ফলস্টাফের প্রভাব বরাবর থাকবে অবিচলিত।

জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে অদৃশ্য, তবুও বহু শত আছে যা প্রত্যক্ষ, ইতিহাসে যা উজ্জ্বল। জীবনের এই সৃষ্টিকার্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে। সেইরকম সাহিত্যই ধন্য—ধন্য ডন কুইকসট, ধন্য রবিনসন ক্রুশো। আমাদের ঘরে ঘরে রয়ে গেছে, আঁকা পড়ছে জীবনশিল্পীর রূপ-রচনা।

কোনো-কোনোটা ঝাপসা, অসম্পূর্ণ এবং অসমাপ্ত, আবার কোনো-কোনোটা উজ্জ্বল। সাহিত্যে যেখানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষকালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে ওঠে সেইখানেই সাহিত্যের অমরাবতী। কিন্তু জীবন যেমন মূর্তিশিল্পী তেমনি জীবন রসিকও বটে। সে বিশেষ ক'রে রসেরও কারবার করে। সেই রসের পাত্র যদি জীবনের স্বাক্ষর না পায়, যদি সে বিশেষকালের বিশেষত্ব মাত্র প্রকাশ করে বা কেবলমাত্র রচনাকৌশলের পরিচয় দিতে থাকে তাহলে সাহিত্যে সেই রসের সঞ্চয় বিকৃত হয় বা শুষ্ক হয়ে মারা যায়। যে-রসের পরিবেশনে মহারসিক জীবনের অকৃত্রিম আস্বাদনের দান থাকে সে-রসের ভোজে নিমন্ত্রণ উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা থাকে না।

"চরণ নখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে" এই লাইনের মধ্যে বাক্‌চাতুরী আছে কিন্তু জীবনের স্বাদ নেই। অপর পক্ষে "তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে রং আছে উজ্জ্বলি সে রং দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচলি", এর মধ্যে জীবনের স্পর্শ পাই, একে অসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

শান্তিনিকেতন, উদয়ন ২৫ এপ্রিল ১৯৪১

সাহিত্যে চিত্রবিভাগ

আমরা পূর্বেই বলেছি যে সাহিত্যে চিত্রবিভাগ যদি জীবনশিল্পীর স্বাক্ষরিত হয়, তবে তার রূপের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। জীবনের আপন কল্পনার ছাপ নিয়ে আঁকা হয়েছে যে-সব ছবি, তারই রেখায় রেখায় রঙে রঙে সকল দেশে সকল কালে মানুষের সাহিত্য পাতায় পাতায় ছেয়ে গেছে। তার কোনোটা বা ফিকে হয়ে এসেছে, ভেসে বেড়াচ্ছে ছিন্নপত্র তার আপন কালের স্রোতের সীমানায়। তার বাইরে তাদের দেখতেই পাওয়া যায় না। আর কতকগুলি আছে চিরকালের মতন সকল মানুষের চোখের কাছে সমুজ্জ্বল হয়ে। আমরা একটি ছবির সঙ্গে পরিচিত আছি, সে রামচন্দ্রের। তিনি প্রজারঞ্জনের জন্যে নিরপরাধা সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন। এতবড়ো মিথ্যা ছবি খুব অল্পই আছে সাহিত্যের চিত্রশালায়। কিন্তু যে লক্ষ্মণ আপন হৃদয়ের বেদনার সঙ্গে অমিল হলে অধৈর্যের সঙ্গে উড়িয়ে দিতেন শাস্ত্রের উপদেশ এবং দাদার পন্থার অনুসরণ অথচ চিরাভ্যস্ত সংস্কারের বন্ধনকে কাটাতে না পেরে নিষ্ঠুর আঘাত করতে বাধ্য হয়েছেন আপন শুভবুদ্ধিকে, যার মতন কঠিন আঘাত জগতে আর নেই,—সেই সর্বত্যাগী লক্ষ্মণের ছবি তাঁর দাদার ছবিকে ছাপিয়ে চিরকাল সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ওদিকে দেখো ভীষ্মকে, তাঁর গুণগানের অন্ত নেই অথচ কৌরবসভার চিত্রশালায় তাঁর ছবির ছাপ পড়ল না। তিনি বসে আছেন একজন নিষ্কর্মা ধর্ম-উপদেশ-প্রতীকমাত্র হয়ে। ওদিকে দেখো কর্ণকে, বীরের মতন উদার অথচ অতিসাধারণ মানুষের মতন বার বার ক্ষুদ্রাশয়তায় আত্মবিস্মৃত। এদিকে দেখো বিদুরকে, সে নিখুঁত ধার্মিক। এত নিখুঁত যে, সে কেবল কথাই কয় কিন্তু কেউ তার কথা মানতেই চায় না। অপর পক্ষে স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র ধর্মবুদ্ধির বেদনায় প্রতি-

মুহূর্তে পীড়িত অথচ স্নেহে দুর্বল হয়ে এমন অন্ধভাবে সেই বুদ্ধিকে ভাসিয়ে দিয়েছেন যে যদিচ জেনেছেন অধর্মের এই পরিণাম তাঁর স্নেহাস্পদের পক্ষে দারুণ শোচনীয়, তবু কিছুতে আপনার দোলায়িত চিত্তকে দৃঢ়ভাবে সংযত করতে পারেন নি। এই হল স্বয়ং জীবনের কল্পিত ছবি। মনুসংহিতার শ্লোকের উপরে উপদেশের দাগা-বুলোনো নয়। এই ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য হারালেন, প্রাণাধিক সন্তানদের হারালেন, কিন্তু সাহিত্যের সিংহাসনে এই দিকভ্রান্ত অন্ধ তিনি চিরকালের জন্যে স্থির রইলেন।

রূপসাহিত্যে তাই যখন দেখি কবি তাঁর নায়কের পরিমাণ বাড়িয়ে বলবার জন্যে বাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করেছেন আমরা তখন স্বতই সেটাকে শোধন করে নিই। আমাদের সত্যলোকের ভীম কখনই তালগাছ উপড়ে লড়াই করেন নি। এক গদাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। রূপের রাজ্যে মানুষ ছেলে ভুলিয়েছিল, যে-যুগে মানুষ ছেলেমানুষ ছিল। তার পর থেকে জনশ্রুতি চলে এসেছে বটে কিন্তু কালের হাতে ছাঁকাই পড়ে মনের মধ্যে তার সত্য রূপটুকু রয়ে গেছে। তাই হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন এখনো কানে শুনি কিন্তু আর চোখে দেখতে পাই নে, কেননা আমাদের দৃষ্টির বদল হয়ে গেছে।

রসের ভোজেও এই কথা খাটে। সেখানে সেই ভোজে যেখানে জীবনের স্বহস্তের পরিবেশন, সেখানে রসের বিকৃতি নেই। শিশু কৃষ্ণ চাঁদ দেখবার জন্য কান্না ধরলে পর যে-সাহিত্যে তার সামনে আয়না ধরে তার নিজের ছবি দেখিয়ে তাকে সান্ত্বনা করেছিল, সেখানে এই রচনানৈপুণ্যে ভক্তরা যতই হায় হায় করে উঠুক, শিশুবাৎসল্যের এই রসের কৃত্রিমতা কোনো দেশের অভ্যাসের আসরে যদি বা মূল্য পায়, মহাকালের পণ্যশালায় এর কোনো মূল্য নেই। এই কাব্যের কৃত্রিমতার কুস্বাদ যদি বদল করতে চাও, তাহলে এই কবিতাটি পড়ো :

দধি মন্থ ধ্বনি, শুনইতে নীলমণি

আওল সঙ্গে বলরাম।

যশোমতি হেরি মুখ, পাওল মরমে সুখ

চুম্বয়ে চান্দ-বয়ান॥

কহে শুন যাদুমণি, তোরে দিব ক্ষীর ননী

খাইয়া নাচহ মোর আগে।

নবনী-লোভিত হরি, মায়ের বদন হেরি

কর পাতি নবনীত মাগে॥

রানী দিল পুরি কর খাইতে রঙ্গিমাধর

অতি সুশোভিত ভেল তায়।

খাইতে খাইতে নাচে, কটিতে কিঙ্কিণী বাজে

হেরি হরষিত ভেল মায়॥

নন্দদুলাল নাচে ভালি।

ছাড়িল মন্থনদণ্ড, উথলিল মহানন্দ

সঘনে দেই করতালি॥

দেখো দেখো রোহিণী, গদ গদ কহে রানী,

যাদুয়া নাচিছে দেখো মোর।

ঘনরাম দাসে কয়, রোহিণী আনন্দময়

দুহুঁ ভেল প্রেমে বিভোর॥

এ যে আমাদের ঘরের ছেলে, এ চাঁদ তো নয়। এ রস যুগে যুগে আমাদের মনে সঞ্চিত হয়েছে। মা চিরকাল একে লোভ দেখিয়ে নাচিয়েছে, চাঁদ দেখিয়ে ভোলায় নি।

রসের সৃষ্টিতে সর্বত্রই অত্যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু সে অত্যুক্তিও জীবনের পরিমাণ রক্ষা ক'রে তবে নিষ্কৃতি পায়। সেই অত্যুক্তি যখন

বলে, "পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে" তখন মন বলে, এই মিথ্যে কথার চেয়ে সত্য কথা আর হতে পারে না। রসের অত্যুক্তিতে যখন ধ্বনিত হয়, "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল", তখন মন বলে, যে-হৃদয়ের মধ্যে প্রিয়তমকে অনুভব করি সেই হৃদয়ে যুগযুগান্তরের কোনো সীমাচিহ্ন পাওয়া যায় না। এই অনুভূতিকে অসম্ভব অত্যুক্তি ছাড়া আর কী দিয়ে ব্যক্ত করা যেতে পারে। রসসৃষ্টির সঙ্গে রূপসৃষ্টির এই প্রভেদ। রূপ আপন সীমা রক্ষা করেই সত্যের আসন পায়। আর রস সেই আসন পায় বাস্তবকে অনায়াসে উপেক্ষা ক'রে।

তাই দেখি সাহিত্যের চিত্রশালায় যেখানে জীবনশিল্পীর নৈপুণ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেখানে মৃত্যুর প্রবেশদ্বার রুদ্ধ। সেখানে লোকখ্যাতির অনিশ্চয়তা চিরকালের জন্যে নির্বাসিত। তাই বলছিলেম, সাহিত্যে যেখানে সত্যকার রূপ জেগে উঠেছে সেখানে ভয় নেই। চেয়ে দেখলে দেখা যায় কী প্রকাণ্ড সব মূর্তি, কেউ বা নীচ শকুনির মতো মন্থরার মতো, কেউ বা মহৎ ভীমের মতো দ্রৌপদীর মতো—আশ্চর্য মানুষের অমর কীর্তি জীবনের চিরস্বাক্ষরিত। সাহিত্যের এই অমরাবতীতে যাঁরা সৃষ্টিকর্তার আসন নিয়েছেন তাঁদের কারো বা নাম জানা আছে, কারো বা নেই, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে তাঁদের স্পর্শ রয়ে গেছে। তাঁদের দিকে যখন তাকাই তখনই সংশয় জাগে নিজের অধিকারের প্রতি।

আজ জন্মদিনে এই কথাই ভাববার—রসের ভোজে কিংবা রূপের চিত্রশালায় কোন্‌খানে আমার নাম কোন্ অক্ষরে লেখা পড়েছে। লোকখ্যাতির সমস্ত কোলাহল পেরিয়ে এই কথাটি যদি দৈববাণীর যোগে কানে এসে পৌঁছতে পারত, তাহলেই আমার জন্মদিনের আয়ু নিশ্চিত নির্ণীত হত। আজ তা বহুতর অনুমানের দ্বারা জড়িত বিজড়িত।

শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩৪৮

সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা

·· আমরা যে ইতিহাসের দ্বারাই একান্ত চালিত এ-কথা বার বার শুনেছি এবং বার বার ভিতরে ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি। এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে, যেখানে আমি আর-কিছু নই কেবলমাত্র কবি। সেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত। বাহিরের বহুতর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নই। ঐতিহাসিক পণ্ডিত আমার সেই কাব্যস্রষ্টার কেন্দ্র থেকে আমাকে টেনে এনে ফেলে যখন আমার সেটা অসহ্য হয়। একবার যাওয়া যাক কবি-জীবনের গোড়াকার সূচনায়।

শীতের রাত্রি—ভোরবেলা, পাণ্ডুবর্ণ আলোক অন্ধকার ভেদ করে দেখা দিতে শুরু করেছে। আমাদের ব্যবহার গরিবের মতো ছিল। শীতবস্ত্রের বাহুল্য একেবারেই ছিল না। গায়ে একখানামাত্র জামা দিয়ে গরম লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতুম। কিন্তু এমন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অন্যান্য সকলের মতো আমি আরামে অন্তত বেলা ছটা পর্যন্ত গুটিসুটি মেরে থাকতে পারতুম। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান সেও আমারই মতো দরিদ্র। তার প্রধান সম্পদ ছিল পুবদিকের পাঁচিল ঘেঁষে একসার নারকেলগাছ। সেই নারকেলগাছের কম্পমান পাতায় আলো পড়বে, শিশিরবিন্দু ঝলমল করে উঠবে, পাছে আমার এই দৈনিক দেখার ব্যাঘাত হয় এইজন্য আমার ছিল এমন তাড়া। আমি মনে ভাবতুম সকালবেলাকার এই আনন্দের অভ্যর্থনা সকল বালকেরই মনে আগ্রহ জাগাত। এই যদি সত্য হত তাহলে সর্বজনীন বালক-স্বভাবের মধ্যে এর কারণের সহজ নিষ্পত্তি হয়ে যেত। আমি যে অন্যদের থেকে এই অত্যন্ত

ঔৎসুক্যের বেগে বিচ্ছিন্ন নই, আমি যে সাধারণ এইটে জানতে পারলে আর কোনো ব্যাখ্যার দরকার হত না। কিন্তু কিছু বয়স হলেই দেখতে পেলুম আর-কোনো ছেলের মনে কেবলমাত্র গাছপালার উপরে আলোকের স্পন্দন দেখবার জন্য এমন ব্যগ্রতা একেবারেই নেই। আমার সঙ্গে যারা একত্রে মানুষ হয়েছে তারা এ পাগলামির কোঠায় কোনোখানেই পড়ত না তা আমি দেখলুম। শুধু তাদের কেন, চারদিকে এমন কেউ ছিল না যে অসময়ে শীতের কাপড় ছেড়ে আলোর খেলা একদিনও দেখতে না পেলে নিজেকে বঞ্চিত মনে করত। এর পিছনে কোনো ইতিহাসের কোনো ছাঁচ নেই। যদি থাকত তাহলে সকালবেলায় সেই লক্ষ্মীছাড়া বাগানে ভিড় জমে যেত, একটা প্রতিযোগিতা দেখা দিত কে সর্বাগ্রে এসে সমস্ত দৃশ্যটাকে অন্তরে গ্রহণ করেছে। কবি যে, সে এইখানেই। স্কুল থেকে এসেছি সাড়ে চারটের সময়। এসেই দেখেছি আমাদের বাড়ির তেতলার ঊর্ধ্বে ঘননীল মেঘপুঞ্জ, সে যে কী আশ্চর্য দেখা। সে একদিনের কথা আমার আজও মনে আছে কিন্তু সেদিনকার ইতিহাসে আমি ছাড়া কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মেঘ সেই চক্ষে দেখে নি এবং পুলকিত হয়ে যায় নি। এইখানে দেখা দিয়েছিল একলা রবীন্দ্রনাথ। একদিন স্কুল থেকে এসে আমাদের পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিলুম। ধোপার বাড়ি থেকে গাধা এসে চরে খাচ্ছে ঘাস—এই গাধাগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির বানানো গাধা নয়, এ আমাদের সমাজের চিরকালের গাধা, এর ব্যবহারে কোনো ব্যতিক্রম হয় নি আদি-কাল থেকে—আর একটি গাভী সস্নেহে তার গা চেটে দিচ্ছে। এই যে প্রাণের দিকে প্রাণের টান আমার চোখে পড়েছিল, আজ পর্যন্ত সে অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। কিন্তু এ-কথা আমি নিশ্চিত জানি সেদিনকার সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথ এই দৃশ্য মুগ্ধচোখে দেখেছিল।

সেদিনকার ইতিহাস আর কোনো লোককে এই দেখার গভীর তাৎপর্য এমন করে বলে দেয় নি। আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনো ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাঁধে নি। ইতিহাস যেখানে সাধারণ, সেখানে ব্রিটিশ সবজেক্ট ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল না। সেখানে রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের বিচিত্র লীলা চলছিল কিন্তু নারকেলগাছের পাতায় যে আলো ঝিলমিল করছিল সেটা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের রাষ্ট্রিক আমদানি নয়। আমার অন্তরাত্মার কোনো রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে সে বিকশিত হয়েছিল এবং আপনাকে আপনার আনন্দরূপে নানাভাবে প্রত্যহ প্রকাশ করছিল। আমাদের উপনিষদে আছে, "ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি"—আত্মা পুত্রস্নেহের মধ্যে সৃষ্টিকর্তারূপে আপনাকে প্রকাশ করতে চায় তাই পুত্রস্নেহ তার কাছে মূল্যবান। সৃষ্টিকর্তা সে, তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু বা ইতিহাস জোগায় কিছু বা তার সামাজিক পরিবেষ্টন জোগায় কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরি করে না। এই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা সে আপনাকে স্রষ্টারূপে প্রকাশ করে। অনেক ঘটনা আছে যা জানার অপেক্ষা করে, সেই জানাটা আকস্মিক। একসময়ে আমি যখন বৌদ্ধ কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ কথা ও কাহিনীর গল্পধারা উৎসের মতো নানা শাখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সেই সময়কার শিক্ষায় এই সকল ইতিবৃত্ত জানবার অবকাশ ছিল সুতরাং বলতে পারা যায় কথা ও কাহিনী সেইকালেরই বিশেষ রচনা। কিন্তু এই কথা ও কাহিনীর রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাই তার কারণ —তাই তো বলেছে আত্মাই কর্তা। তাকে নেপথ্যে রেখে ঐতিহাসিক

উপকরণের আড়ম্বর করা কোনো কোনো মনের পক্ষে গর্বের বিষয়, এবং সেইখানে সৃষ্টিকর্তার আনন্দকে সে কিছু পরিমাণে আপনার দিকে অপহরণ করে আনে। কিন্তু এ সমস্তই গৌণ, সৃষ্টিকর্তা জানে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায়, এ কী করুণায় প্রকাশ পেয়েছিল। এ যদি যথার্থ ঐতিহাসিক হত তাহলে সমস্ত দেশ জুড়ে কথা ও কাহিনীর হরির লুট পড়ে যেত। আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি তার পূর্বে এবং তার পরে এ-সকল চিত্র ঠিক এমন করে দেখতে পায় নি। বস্তুত তারা আনন্দ পেয়েছ এই কারণে, কবির এই সৃষ্টিকর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে। আমি একদা যখন বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখদুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল, তার পূর্বে আর কেউ তা করে নি। কারণ সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে। সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত-প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তার সৃষ্টিতে মানব-জীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লীপার্বণে, আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল-রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ-রাজত্বে তার অতি সরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্প-গুচ্ছে, কোনো সামন্ততন্ত্র নয় কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়। এখনকার সমালোচকেরা যে বিস্তীর্ণ ইতিহাসের মধ্যে অবাধে সঞ্চরণ করেন তার মধ্যে অন্তত বারো আনা পরিমাণ আমি জানিই নে। বোধ করি সেইজন্যই আমার বিশেষ করে রাগ হয়। আমার মন বলে দূর হোক গে তোমার

ইতিহাস। হাল ধরে আছে আমার সৃষ্টির তরীতে সেই আত্মা যার নিজের প্রকাশের জন্য পুত্রের স্নেহ প্রয়োজন, জগতের নানা দৃশ্য নানা সুখ-দুঃখকে যে আত্মসাৎ ক'রে বিচিত্র রচনার মধ্যে আনন্দ পায় ও আনন্দ বিতরণ করে। জীবনের ইতিহাসের সব কথা তো বলা হল না, কিন্তু সে ইতিহাস গৌণ। কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা-মানুষের আত্মপ্রকাশের কামনায় এই দীর্ঘ যুগযুগান্তর তারা প্রবৃত্ত হয়েছে। সেইটেকেই বড়ো করে দেখো যে ইতিহাস সৃষ্টিকর্তা-মানুষের সারথ্যে চলেছে বিরাটের মধ্যে—ইতিহাসের অতীতে সে, মানবের আত্মার কেন্দ্রস্থলে। আমাদের উপনিষদে এ-কথা জেনেছিল এবং সেই উপনিষদের কাছ থেকে আমি যে বাণী গ্রহণ করেছি সে আমিই করেছি, তার মধ্যে আমারই কর্তৃত্ব। ···

শান্তিনিকেতন, মে ১৯৪১

সত্য ও বাস্তব

···মানুষ আপনাকে ও আপনার পরিবেষ্টন বাছাই করে নেয় নি। সে তার পড়ে-পাওয়া ধন। কিন্তু সঙ্গে আছে মানুষের মন; সে এতে খুশি হয় না। সে চায় মনের মতোকে। মানুষ আপনাকে পেয়েছে আপনিই, কিন্তু মনের মতোকে অনেক সাধনায় বানিয়ে নিতে হয়। এই তার মনের মতোর ধারাকে দেশে দেশে মানুষ নানা রূপ দিয়ে বহন করে এসেছে। নিজের স্বভাবদত্ত পাওনার চেয়ে এর মূল্য তার কাছে অনেক বেশি। সে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নি; তাই আপনার সৃষ্টিতে আপনার সম্পূর্ণতা বরাবর সে অর্জন করে নিজেকে পূর্ণ করেছে। সাহিত্যে শিল্পে এই যে তার মনের মতো রূপ, এরই মূর্তি নিয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে সে আপনার সম্পূর্ণ সত্য দেখতে পায়, আপনাকে চেনে। বড়ো বড়ো মহাকাব্যে মহানাটকে মানুষ আপনার পরিচয় সংগ্রহ করে নিয়ে চলেছে, আপনাকে অতিক্রম করে আপনার তৃপ্তির বিষয় খুঁজেছে। সেই তার শিল্প তার সাহিত্য। দেশে দেশে মানুষ আপনার সত্য প্রকৃতিকে আপনার অসত্য দীনতার হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে। মানুষ আপনার দৈন্যকে আপনার বিকৃতিকে বাস্তব জানলেও সত্য বলে বিশ্বাস করে না। তার সত্য তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে সে স্থাপন করে। রাজ্যসাম্রাজ্যের চেয়েও তার মূল্য বেশি। যদি সে কোনো অবস্থায় কোনো কারণে অবজ্ঞাভরে তার গৌরবকে উপহাস করে, তবে সমস্ত সমাজকে নামিয়ে দেয়। সাহিত্য শিল্পকে যারা কৃত্রিম ব'লে অবজ্ঞা করে, তারা সত্যকে জানে না। বস্তুত প্রাত্যহিক মানুষ তার নানা জোড়া-তাড়া-লাগা আবরণে নানা বিকারে কৃত্রিম; সে চিরকালের পরিপূর্ণতার

আসন পেয়েছে সাহিত্যের তপোবনে, ধ্যানের সম্পদে। যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশে অশ্রদ্ধা, সেখানে মানুষ আপনাকে হারায়। তাকে বাস্তব নাম দিতে পারি, কিন্তু মানুষ নিছক বাস্তব নয়। তার অনেকখানি অবাস্তব, অর্থাৎ তা সত্য। তা সত্যের সাধনার দিকে নানা পন্থায় উৎসুক হয়ে থাকে। তার সাহিত্য তার শিল্প একটা বড়ো পন্থা। তা কখনো কখনো বাস্তবের রাস্তা দিয়ে চললেও পরিণামে সত্যের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করে।

শান্তিনিকেতন, জুন ১৯৪১